নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে পোশাকশিল্পের ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা মহানগর

মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন

বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোর মধ্যে পোশাকশিল্প অন্যতম। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাকশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই খাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ এদেশের সস্তা শ্রম। বাংলাদেশের প্রান্তিক খেটে খাওয়া দরিদ্র নারীরা এ সস্তা শ্রমের শ্রমিক। বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের ৯০ শতাংশই নারী। সব মিলিয়ে পোশাকশিল্পের সাথে জড়িত ৫ লাখ মানুষ এবং এর ওপর কোনো-না-কোনোভাবে নির্ভরশীল দেশের প্রায় ২৫ লাখ পরিবার বা সোয়া কোটি মানুষ। এই শিল্প আমাদের নারীশ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে কতটুকু ভূমিকা রাখছে, তা যাচাই করে দেখাই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য। এজন্য লক্ষ্য অনুযায়ী দৈবচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতিতে ঢাকা মহানগরের ৪০টি কারখানা নির্বাচন করে ১১০ জন নারীশ্রমিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে পোশাকশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে পোশাকশিল্প নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখলেও এ খাতে নিয়োজিত নারীশ্রমিকরা তাদের কর্মক্ষেত্রসহ পরিবার ও সমাজে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, এমনকি তারা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের অধিকারের দিক থেকে অহরহ শ্রমআইন লঙ্ঘন করে চলেছেন। এ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালিয়ে সমাধানের পথ খোঁজা হয়েছে।

ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিপ্রধান হলেও বর্তমানে এদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে তৈরি পোশাকশিল্প প্রধান খাত হিসেবে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ১৯৭৬-'৭৭ সালে বেসরকারি উদ্যোগে কয়েকটি কারখানা নিয়ে এ শিল্পের সূচনা হয় (মজুমদার ও জহির, ১৯৯৪)। ১৯৮৩-'৮৪ সালে বাংলাদেশে পোশাক কারখানার সংখ্যা ছিল ১৩৪টি, ২০০৭-'০৮-এ এ সংখ্যা উন্নীত হয় ৪৭৪০-এ, ২০০৯-'১০-এ বেড়ে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ৫০৬৩টিতে। এসব কারখানায় ৩১ লাখ শ্রমিকের ৯০ শতাংশ হচ্ছেন নারী (বিজিএমইএ, ২০১০)। এসব নারীশ্রমিকের ৮৩ শতাংশ গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসিত হয়েছেন এবং এরা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে আগত (মজুমদার ও বেগম, ২০০০)। মূলত গ্রামীণ

দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, বন্যা প্রভৃতি), বাল্যবিয়ে, ফতোয়াবাজি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, তালাক, কুসংস্কারের বলি হবার মতো নানা প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক কারণে এসব নারী পাড়ি জমিয়েছেন ঢাকা মহানগরীতে, যার ৯০ শতাংশ বাস করেন ঢাকা শহরের বিভিন্ন বস্তি এলাকায় (মাঠ জরিপ, ২০১২)।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পোশাকশিল্পের মাধ্যমেই ব্যাপক হারে নারীরা অর্থনৈতিক উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন। ২০০৫-'০৬-এর শ্রমশক্তি জরিপ তথ্য মতে, দেশের মোট শ্রমশক্তি ৪.৯৫ কোটি, যার মধ্যে ১.২১ কোটি নারী (শ্রমশক্তি জরিপ, ২০০৫-'০৬)। আর নারী শ্রমশক্তির বেশির ভাগই নিয়োজিত আছেন পোশাকশিল্পে। দেশের রপ্তানি আয়ের ৭৫ শতাংশ আসে এ খাত থেকে। ১৯৮৩ সালে এ খাত থেকে আয় হয়েছিল ৩১ মিলিয়ন, ২০০৭-'০৮ অর্থবছরে যা এসে দাঁড়ায় ৫১৬৭.২৮ মিলিয়ন এবং ২০১০-'১১ (জুলাই-মার্চ)-এ ৫৯৬১.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (সারণি ১)-এ।

সারণি ১

তৈরি পোশাক থেকে রপ্তানি আয় ও রপ্তানি আয়ের শতকরা হার

অর্থবছর	মোট রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মোট রপ্তানি (শতকরা হার)	প্রবৃদ্ধি
২০০৭-'০৮	৫১৬৭.২৮	৩৬.৬২	১০.৯৪
২০০৮-'০৯	৫৯১৮.৫১	৩৮.০২	১৪.৫৪
২০০৯-'১০	৬০১৩.৪৩	৩৭.১১	১.৬
২০১০-'১১ (জুলাই-মার্চ)	৫৯৬১.৮২	৩৬.৭৯	৩৭.৭৬

উৎস : অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১০, ২০১১

বাংলাদেশে শ্রমের মূল্য অত্যন্ত সস্তা ও শ্রম সহজলভ্য হওয়ায় এ শিল্প দ্রুত বিকশিত হয়েছে, তথাকথিত বিশ্বায়ন যাতে সহায়তা করেছে। ফলে এদেশের পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত নারীরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের এক সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছেন এবং তা পূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করেছেন। লিঙ্গ ও শ্রেণিগত বৈষম্য নারীকে পরিবার ও পরিবারের বাইরে সমাজের বিভিন্ন স্তরে কোনঠাসা করে রেখেছিল, যা থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে পোশাকশিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু যারা এদেশের রপ্তানি আয়ে এত বড়ো অবদান রেখে চলেছেন, তাদের অধিকার পদে পদে লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং তারা প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন; যেমন দীর্ঘ কর্মঘণ্টাব্যাপী শ্রমে বাধ্য হওয়া, কর্তৃপক্ষের খারাপ আচরণ, স্বল্প মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, প্রভৃতি।

শ্রমআইন অনুসারে যেখানে ৫০ জনের অধিক শ্রমিক আছে, সেখানে ক্যান্টিন থাকার আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও অনেক কারখানাতেই তার অস্তিত্ব নেই। স্বল্প আয় ও যাতায়াত সুবিধা কারখানা থেকে দেয়া হয় না বলে প্রতিদিন নারীশ্রমিকদের ৩-৪ কিলোমিটার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫ কিলোমিটার পথ হেঁটে পাড়ি দিতে হয়। দেখা যায়, ২ হাজার শ্রমিকের জন্য ২/৩টির বেশি বাথরুম নেই। মাতৃত্বকালীন ছুটি, ডে কেয়ার সেন্টারের থাকা না-থাকা প্রভৃতি নিয়েও প্রচলিত আইনের সঙ্গে বাস্তবের অনেক পার্থক্য। আইএলও কনভেনশনে বলা হয়েছে, শ্রমিকের মজুরি, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক সুবিধা প্রদান করা মালিকের কর্তব্য। শ্রমিকদের অধিকার প্রদান করলে তা

দেশের সার্বিক শিল্পের জন্যই ইতিবাচক হয়; যেমন শিশুশ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করার পরে এ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে (মজুমদার, ২০০৭)। কিন্তু এসব ব্যাপারে মালিকপক্ষ উদাসীন। এ উদাসীনতার ফলেই দেখা যায়, ২০০৮ সালের প্রথম ৬ মাসে ১৬৬ জন গার্মেন্টস কর্মী কর্মস্থলের দুর্ঘটনায় মারা যান। ২১৪ জন কর্মী কর্মস্থলে যাওয়া ও আসার পথে দুর্ঘটনায় মারা যান (আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ২০০৯)। ২০১২-এর ২৪ নভেম্বর-এ সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুরের এক তাজরীন গার্মেন্টসেই পুড়ে মারা যান ১১১ জন শ্রমিক। এদিকে গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৩-এ মোহাম্মদপুরের বেড়িবাঁধ এলাকার স্মার্ট গার্মেন্টসের অগ্নিকাণ্ডে পদদলিত হয়ে মারা যান ৭ জন। শেষোক্ত দুটি ঘটনায় বিভিন্ন মাত্রায় আহত হন অসংখ্য কর্মী।

কারখানা আইন ১৯৬৫, কারখানা বিধিমালা ১৯৭৯, আইএলওর বিভিন্ন কনভেনশন এবং কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা ও অধিকারসংক্রান্ত ঘোষণা শ্রমিককে তার কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার অধিকার প্রদান করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ পোশাক কারখানা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে না। তাছাড়া যৌন হয়রানির শিকার হওয়া, চাকুরির অনিশ্চয়তা, স্বল্প মজুরি, বাধ্যতামূলক শ্রমদান, লিঙ্গগত বৈষম্য, অবসর বা ছুটি না-পাওয়া ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় প্রায় সব নারীশ্রমিককে। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও শ্রমিকদের অব্যাহত আন্দোলনের মুখে সরকার নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করেছে (সারণি ২), যেখানে ন্যূনতম বেতন ধরা হয়েছে ৩০০০ টাকা। কিন্তু এটিও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

সারণি ২

গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য সরকার-নির্ধারিত বেতন কাঠামো (২০১০)

পদ	গ্রেড	বেসিক	বাড়ি ভাড়া	মেডিকেল	মোট
সিনিয়র/অপারেটর/সমমান	৩	২৮৭০	১১৪৮	২০০	৪২১৮
অপারেটর/সমমান	৪	২৬১৫	১০৪৬	২০০	৩৮৬১
জুনিয়র অপারেটর/সমমান	৫	২৩৯৫	৯৫৮	২০০	৩৫৫৩
সাধারণ অপারেটর	৬	২২৩০	৮৯২	২০০	৩৩২২
হেলপার	৭	২০০০	৮০০	২০০	৩০০০

উৎস : বিজিএমইএ, ২০১১

যেহেতু গার্মেন্টস শিল্প এদেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত, কাজেই স্বভাবতই এ খাতের বিভিন্ন দিক নিয়ে অতীতে কয়েকটি গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে। যেমন মাইনুল ইসলাম (১৯৯১) তাঁর 'Labour migration on development: A case study of a rural community Bangladesh' প্রবন্ধে ৭০-এর দশকে রাজধানীতে নারীরা তাদের প্রথাভঙ্গ করে কীভাবে পুরুষের পাশাপাশি চাকুরি খুঁজতে ও কাজ করতে শুরু করল সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং এক্ষেত্রে পশ্চিমা প্রভাব ও অর্থনৈতিক চাপ কতটা প্রবল ছিল তা-ও এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। লায়লা কবির (১৯৯০) তাঁর 'বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে নারী পরিশ্রম : সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা' শীর্ষক প্রবন্ধে নারীশ্রমিকদের গার্মেন্টস শিল্পের মতো একটি দৃশ্যমান পেশায় যুক্ত হওয়ার পেছনে যে ধরনের সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা ভূমিকা রাখে তা আলোচনা করেছেন। তিনি নারীশ্রমিকের অধিক হারে

গার্মেন্টস শিল্পের সাথে যুক্ত হওয়াকে বস্তুগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। ফিলিপ গাইন (১৯৯০) তাঁর 'বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে নারীশ্রমিক' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থে নারীদের শোষণের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি নারীশ্রমিকদের আইনগত অধিকার, কম মজুরি, মজুরি বঞ্চনা, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি পোশাকশিল্পের মালিকদের শোষণের চিত্র তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তিনি পোশাকশিল্পে মালিকেরও যে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে এবং তাঁরা এই অমানবিক আচরণ করতে বাধ্য হয় কি না তা তলিয়ে দেখতে বলেছেন। বস্তুত তিনি বিভিন্ন প্রপঞ্চ ব্যাখ্যার মাধ্যমে নারীর শোষণের চিত্র তুলে ধরেছেন। মজুমদার ও বেগম (২০০০) তাঁদের 'The gender imbalances in the export oriented garment industry in Bangladesh' গ্রন্থে দেখান, ৯৩ শতাংশ নারীশ্রমিকের এ পেশায় আসার আগে কাজ করার কোনো ধরনের অভিজ্ঞতা ছিল না এবং তাদের দুর্বলতা, অজ্ঞতা ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কীভাবে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে। উক্ত গ্রন্থে তাঁরা পোশাকশ্রমিকদের সমস্যার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন এবং নারীশ্রমিকদের প্রতি বঞ্চনা চূড়ান্তভাবে যে উৎপাদনপ্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কাজী রিনা রেজা (২০০৫) 'গার্মেন্টস শ্রমিকদের দুরবস্থা' শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, গ্রাম থেকে উঠে আসা পশ্চাৎপদ নারীরা কীভাবে এ পেশায় যুক্ত হলো এবং তাদের প্রাপ্য পাওনা থেকে সুকৌশলে মালিকপক্ষ কীভাবে বঞ্চিত করে সামাজিক দুরবস্থায় তাদের (নারীশ্রমিক) নিপতিত করেছে। প্রতিমা পাল-মজুমদার (২০০২) তাঁর 'Organizing Women Garment Workers' শীর্ষক গবেষণায় আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে পোশাকশিল্পকে উন্নীত করার পেছনে নারীশ্রমিকদের অবদান ও তাদের প্রতি বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরে তার প্রতিকারের উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আসমা সাদিয়া (২০০৬) তাঁর 'নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক গ্রন্থে পোশাকশিল্পে নারীদের অংশগ্রহণ, তাদের পারিবারিক ও সামাজিক দুরবস্থা, এ পেশায় নিযুক্ত হবার ফলে পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার তারা কীভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারছেন, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাদের কর্মপরিবেশ উন্নত হলে যে তারা অধিকতর উৎপাদনশীল হতে পারবেন তা নিয়েও আলোচনা করেছেন।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে পোশাকশিল্পের ভূমিকা কী তা জানা। এছাড়া যেসব বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে, তা হলো—

১. পোশাকশিল্পে কর্মরত নারীশ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা;
২. পোশাকশিল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নারীরা কতটুকু আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন তা জানা;
৩. নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পোশাকশিল্প কতটুকু ভূমিকা পালন করছে সে সম্পর্কে জানা; এবং
৪. নারী পোশাকশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র, পরিবার ও সামাজিক জীবনের সমস্যাগুলো উদঘাটন করা।

তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় যেসব তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার অধিকাংশই প্রাথমিক পর্যায়ের উৎস থেকে সংগৃহীত এবং তার সাথে সংগতি রেখে দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাত্তসমূহও সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য ঢাকা মহানগরে তেজগাঁও, মুগধা ও মিরপুর এলাকা থেকে দৈবচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতিতে ৪০টি গার্মেন্টস থেকে ১১০ জন নারীশ্রমিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতি গার্মেন্টস থেকে কমপক্ষে ২ জন নারীশ্রমিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে প্রশ্নমালা তৈরি ও পাইলট সার্ভে করা হয়েছে। যার সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন সম্পূরক প্রশ্নের মাধ্যমে গবেষণাকে আরো যুক্তিযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত তথ্য, প্রতিবেদন প্রভৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন গবেষণাকর্ম ও লাইব্রেরির সাহায্য নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য সংগ্রহের পর তা প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কোডিং করে সেগুলোর কম্পিউটার এন্ট্রি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক মানগুলোকে অপরিবর্তিত রেখে গুণবাচক মানগুলোকে সংখ্যায় পরিবর্তন করে নেয়া হয়েছে। ডাটা এন্ট্রির পর এসপিএসএস (স্ট্যাটিস্টিকেল প্যাকেজ ফর সোশ্যাল সায়েন্সেস) এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উপাত্তসমূহকে প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞায়ন

পোশাকশিল্প : শিল্প-সম্পর্কিত অধ্যাদেশ (১৯৬৯) অনুযায়ী শিল্প বলতে কোনো ব্যবসা, বাণিজ্য ও উৎপাদন কাজে কোনো অফিস, ফার্ম, শিল্প ইউনিট, দোকান বা প্রতিষ্ঠান, যেখানে কোনো কারখানা পরিচালনার জন্য শ্রমিক নিযুক্ত করা হয় তাকে বোঝানো হয়েছে। এক কথায় পোশাকশিল্প বলতে বোঝায়, যেখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পোশাক তৈরি করা হয়।

নারীশ্রমিক : যেসব নারী নির্দিষ্ট শ্রমঘণ্টার বিপরীতে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম প্রদান করেন, তাদের এখানে নারীশ্রমিক বলা হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা : সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদান মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করার দরুন যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে এখানে আর্থ-সামাজিক অবস্থা বলা হয়েছে।

ক্ষমতায়ন : বর্তমান গবেষণায় ক্ষমতায়ন বলতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নারী পোশাকশ্রমিকদের ক্ষমতায়নকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং এখানে ক্ষমতায়ন বলতে উক্ত নারীশ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ, পরিবারে মতামত প্রদানের স্বাধীনতা, অর্জিত বেতনের টাকা নিজে খরচ করার স্বাধীনতা, ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশে পোশাকশিল্পের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৯৬৭-'৭৭ সালে এক জার্মান রপ্তানিকারকের সহায়তায় সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে মাত্র গুটিকয়েক কারখানা নিয়ে রপ্তানি ক্ষেত্রে পোশাকশিল্পের গোড়াপত্তন হয়। সেই থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত মাত্র ৩৩ বছরের মধ্যে এই শিল্প সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০৬৩টিতে। এ শিল্পের এত দ্রুত অগ্রগতির পেছনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ থাকলেও অন্যতম প্রধান কারণটি হচ্ছে বাংলাদেশে শ্রমের সস্তা বাজার ও সহজপ্রাপ্যতা। যেহেতু পোশাকশিল্প একটি শ্রমঘন শিল্প, সুতরাং

এই শিল্পের উৎপাদন খরচের সিংহভাগজুড়েই রয়েছে শ্রম খরচ। তাই যেখানে তুলনামূলকভাবে সস্তা শ্রম পাওয়া যায়, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

পোশাকশিল্পের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, একমাত্র শ্রমমূল্যের হেরফেরের কারণেই এই শিল্প এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে পোশাকশিল্পের গোড়াপত্তন ঘটেছিল উন্নত দেশসমূহেই। কিন্তু অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে সে দেশগুলোতে শ্রমের মূল্য বেড়ে যায় কয়েকগুণ। তাতে পোশাকশিল্প থেকে মুনাফার অঙ্ক কমে যায়। কিন্তু এই শিল্প থেকে মুনাফার হার সংরক্ষিত করে রাখার জন্য উন্নত দেশগুলো তাদের উৎপাদন উপকরণ নিয়ে স্বল্পমূল্যের শ্রমবাজার খুঁজে বেড়াতে থাকে। তারা অতি সহজেই খুঁজে পায় এশিয়ার সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, হংকং ও দক্ষিণ কোরিয়ার সস্তা শ্রমবাজার। এর পরে পোশাকশিল্পের শ্রমবাজারে যুক্ত হয় বাংলাদেশ। বিশেষ করে সস্তাশ্রমকে কেন্দ্র করে সেখানে গড়ে ওঠে পোশাকশিল্প। তখন এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণের বেশির ভাগই আসতে থাকে অন্যদেশ থেকে। পরবর্তী সময়ে একই কারণে এই চারটি দেশের সাথে যোগ দেয় শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ফিলিপাইন এবং ভারত। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০টি এবং এতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০ হাজার (বিবিএস, ২০০৩)। বর্তমানে এই শিল্পের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০০০-এর ওপরে এবং শ্রমিকের সংখ্যা ৩.১ মিলিয়নে (বিজিএমইএ, ২০১০)। বাংলাদেশের কর্মজীবী নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পোশাকশিল্পে নিয়োজিত, যাদের সংখ্যা ১.৩ মিলিয়ন (বাংলাদেশ লেবার ফোর্স ১৯৯৯-২০০০)। ২০০৫ সালের তথ্যানুযায়ী এই সেক্টরে এখন নিয়োজিত আছেন প্রায় ২০ লাখ শ্রমিক-কর্মচারী, যার ৯০ শতাংশই নারী। ফলে নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ ভারসাম্যের ক্ষেত্রেও এই সেক্টরের অবদান সর্বোচ্চ (রশীদ, ২০১০; বিজিএমইএ, ২০১০)।

জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে তৈরি পোশাকশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। হিসেব ধরলে এই সেক্টর থেকেই এখন আসছে দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় ৭৫ শতাংশের মতো। নিট হিসেব ধরলেও বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনে এই সেক্টরের অবদান কোনোক্রমেই ৫০ শতাংশের নিচে নয়। এক কথায়, তৈরি পোশাকশিল্প সেক্টরই হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী একক বৃহত্তম শিল্পখাত। আবার এই শিল্পের কারণে পর্যটন, ব্যাংক, বিমা, পরিবহণ, ইত্যাদি খাতসহ অন্যান্য শিল্প যেমন কার্টুন, নিটিং, পলিব্যাগ, বোতাম, সুতা, প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিংসহ অসংখ্য শিল্পের প্রসার ঘটেছে। এছাড়াও এই সেক্টরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে আরো অন্তত ৫ লক্ষ মানুষ। মোট কথা, এই সেক্টরের ওপর নির্ভরশীল দেশের প্রায় ২৫ লাখ পরিবার বা সোয়া কোটি মানুষ (রশীদ, ২০১০)।

সস্তা শ্রমের কারণে এ দেশগুলোতে উৎপাদিত পোশাক সহজেই উন্নত দেশগুলোর বাজার দখল করে নেয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত দেশসমূহের পোশাকশিল্প দারুণভাবে হুমকির সম্মুখীন হয়। উন্নত দেশসমূহের উচ্চ শ্রমমূল্যের জন্য সেখানে উৎপাদন খরচ অনেক বেশি হওয়ায় তারা স্বল্পমূল্যের দেশসমূহের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছিল না। এর ফলেই মূলত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে পোশাক আমদানির ওপর কোটা আরোপিত হয়।

মোদ্দা কথা হলো, একমাত্র সস্তাশ্রমকে পুঁজি করেই বাংলাদেশের পোশাকশিল্প গড়ে উঠেছে; এবং শ্রমের সহজ ও সুলভ প্রাপ্যতার সুযোগে এই শিল্পের দ্রুত বিকাশও ঘটেছে। আর অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে দেশ।

পোশাকশ্রমিকদের কল্যাণে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশে শ্রমকল্যাণমূলক কার্যাবলির অন্যতম প্রধান ভিত্তি শ্রমআইন। শ্রমআইনসমূহই অদ্যাবধি এ দেশের শ্রমিকদের বড়ো রক্ষাকবচ। যদিও সমালোচনা আছে যে, প্রয়োজনের তুলনায় আইনের অপ্রতুলতা আছে। তথাপি এখনো শ্রমআইনসমূহের আলোকে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি গৃহীত হয়ে থাকে। আইএলওর কনভেনশনসমূহ ও দেশের শ্রমনীতির ভূমিকা এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ববহ।

বাংলাদেশের শ্রমিকদের কর্মঘণ্টা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, প্রসূতি শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুবিধা বা ভাতা প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে পূর্বে মোট ৪৪টি আইন প্রচলিত ছিল (খান, ১৯৯৬)। বর্তমানে একটি আইনে তা সন্নিবেশিত হয়েছে, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

২০০৬ সালে সরকার শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় 'শ্রমআইন ২০০৬' প্রণয়ন করে, যেখানে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, নিরাপত্তা, দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে।

তাছাড়া এই আইনের দুর্বলতাসমূহ কাটিয়ে উঠতে, বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ প্রণয়ন করে, যা ২৯ এপ্রিল ২০০৮-এ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এখানে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অফিস স্থাপন এবং কল্যাণ তহবিলের ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করে বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক গঠিত 'শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়', যা ১৯৭৬ সাল থেকে ৪ বার ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়ে বর্তমান নাম ও কাঠামো গ্রহণ করেছে। এই মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মপরিধি রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অকৃষিখাতে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণসাধন, শ্রম পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, শ্রমআইনের প্রয়োগ ও এ-সংক্রান্ত বিধি নির্ধারণ, শ্রম সম্মেলন, শ্রমিকদের শিক্ষা কার্যক্রম, শ্রম ও শিল্পকল্যাণ সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালা বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত মূল্যায়ন ইত্যাদি।

বাংলাদেশে বিদ্যমান শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন গঠনের ওপর জোর দিয়ে 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬' প্রণয়ন করা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রের উন্নতি ও তাদের সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান করার লক্ষ্যে ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালে এই সংস্থা জাতিসংঘের সহায়ক সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ সংস্থার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ তার কনভেনশনসমূহ। ২০০৭ সাল পর্যন্ত আইএলওর মোট কনভেনশন ১৮৮টি, বাংলাদেশ যার ৩৩টি কনভেনশন মেনে চলার অঙ্গীকার করেছে। কনভেনশনসমূহ হলো : ১, ৪, ৬, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৭, ২৯, ৩২, ৪৫, ৫৯, ৮০, ৮১, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯৬, ৯৮, ১০০, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১১১, ১১৬, ১১৮, ১৪৪, ১৪৯ ও ১৮২।

এছাড়াও সরকারের অন্যান্য আইনের মধ্যে রয়েছে ১৯৬৫ সালের কারখানা আইন, কারখানা বিধিমালা ১৯৭৯ এবং শিল্প পুলিশ আইন। পুলিশের এই বিশেষ বাহিনী কারখানার অভ্যন্তরীণ

নিরাপত্তা বিধান, উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ, কারখানার সম্পদের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে থাকে।

নারীশ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

উত্তরদাতা নারীশ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক পদমর্যাদা কতগুলো মানদণ্ডের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে শ্রমিকদের বয়সকাঠামো, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিবারের ধরন, কর্মস্থলের পদমর্যাদা, বেতন কাঠামো ও পারিবারিক আয়।

পোশাকশিল্পে কর্মরত নারীশ্রমিকদের বয়স কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৫৩.৬৪ শতাংশ শ্রমিকের বয়স ২০-৩০ বছরের মধ্যে এবং সর্বনিম্ন ১৪.৫৫ শতাংশ শ্রমিকের বয়স ৩০-৪০ বছরের মধ্যে। এছাড়া ৩১.৮২ শতাংশ শ্রমিকের বয়স ১০-২০ বছরের মধ্যে (সারণি ৩)। শ্রমিকদের গড় বয়স ২৩.৫৪ বছর। ১০-২০ বছরের শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই শিশু। শিশু অধিকার সনদ অনুসারে ১৮ বছরের চাইতে কম বয়সী সকল মানুষকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং সকল শিশুকেই কাজ করার অনুপযুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশের শ্রমআইন ২০০৬-এ ১৮ বছরের নিচে কাউকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেয়া আইনত নিষিদ্ধ করলেও বাংলাদেশের পোশাকশিল্প এ আইনকে লঙ্ঘন করেছে। এ থেকে বোঝা যায়, শ্রমআইন শিশু নিয়োগ না-করার ব্যাপারে জোর দিলেও তা এখনো কার্যকর করা হয় নি।

সারণি ৩

নারীশ্রমিকদের বয়স কাঠামো ও বৈবাহিক অবস্থা

বয়স কাঠামো (বছর)	**শ্রমিকের সংখ্যা** (জন)	**শতকরা হার (%)**	**বৈবাহিক অবস্থা**	**শ্রমিকের সংখ্যা** (জন)	**শতকরা হার** (%)
১১-২০	৩৫	৩১.৮২	বিবাহিত	৫৩	৪৮.১৮
২১-৩০	৫৯	৫৩.৬৪	অবিবাহিত	৪১	৩৭.২৭
৩১-৪০	১৬	১৪.৫৫	বিচ্ছিন্ন	১০	৯.০৯
মোট	১১০	১০০	তালাকপ্রাপ্ত	৬	৫.৪৫
			মোট	১১০	১০০

উৎস : প্রশ্নমালা জরিপ, ২০১২

পোশাকশিল্পে কর্মরত নারীদের বৈবাহিক অবস্থা ভীষণভাবে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার নির্ণায়ক। গবেষণায় জরিপকৃত নারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৮.১৮ শতাংশ বিবাহিত, ৩৭.২৭ শতাংশ অবিবাহিত, ৯.০৯ শতাংশ বিচ্ছিন্ন ও ৫.৪৫ শতাংশ তালাকপ্রাপ্ত (সারণি ৩)। নিম্নবিত্ত নারীদের সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী অল্প বয়সে বিয়ের প্রথা থাকলেও উপার্জনে নিয়োজিত থাকার কারণে এই নারীদের অনেককেই অবিবাহিত থাকতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষ উপার্জনে যুক্ত হওয়া তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতাকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে।

শিক্ষা নারীশ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। পোশাকশিল্পে কর্মরত অধিকাংশ নারীই প্রাথমিক বিদ্যালয় অতিক্রম করেন নি। সর্বোচ্চ ৫৫.৪৫ শতাংশ নারীশ্রমিক

প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন, ২৮.২৮ শতাংশ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন এবং ১৩.৬৪ শতাংশ শ্রমিকের কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতাই নেই (সারণি ৪)। অধিকাংশই প্রাথমিক স্তর শেষ হবার সাথে সাথেই যোগ দিয়েছেন পোশাক কারখানায়।

সারণি ৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার (%)	পরিবারের ধরন	শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার (%)
নেই	১৫	১৩.৬৪	একক পরিবার	৭০	৬৩.৬৪
প্রাথমিক	৬১	৫৫.৪৫	যৌথ পরিবার	৪০	৩৬.৩৬
মাধ্যমিক	৩১	২৮.১৮	মোট	১১০	১০০
উচ্চমাধ্যমিক	৩	২.৭৩			
মোট	১১০	১০০			

উৎস : প্রশ্নমালা জরিপ, ২০১২

উত্তরদাতাদের ৬৩.৮৮ শতাংশ একক পরিবারে ও ৩৪.৭২ শতাংশ যৌথ পরিবারে বসবাস করেন (সারণি ৪)। গার্মেন্টসে কাজ করার আগে ১৬.৬৬ শতাংশ অন্য কোনো কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, তারা অদক্ষ অবস্থায় এ কাজে নিয়োজিত হয়েছেন এবং তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মালিকপক্ষ তাদের বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করছেন।

সারণি ৫

গার্মেন্টসে কর্মরত উত্তরদাতাদের কর্মক্ষেত্রে পদবিন্যাস

পদবিন্যাস	শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার (%)
সিনিয়র অপারেটর	৭	৬.৩৭
অপারেটর	৩৪	৩০.৯০
জুনিয়র অপারেটর	১১	১০
সাধারণ অপারেটর	৩	২.৭২
হেলপার	৩২	২৯.০৯
অন্যান্য	২৩	২০.৯০
মোট	১১০	১০০

উৎস : প্রশ্নমালা জরিপ, ২০১২

উত্তরদাতা নারীশ্রমিকদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩০.৯০ শতাংশ অপারেটর পদে, ২৯.০৯ শতাংশ হেলপার পদে ও সর্বনিম্ন ২.৭২ শতাংশ সাধারণ অপারেটর পদে কাজ করেন (সারণি ৫)। সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অধিকাংশ নারীশ্রমিক নিচু পদে কাজ করেন। এর কারণ হিসেবে নারীশ্রমিকদের নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা না-থাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সারণি ৬

পোশাকশ্রমিকদের বেতন কাঠামো ও পরিবারের মোট আয় *(অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি)*

বেতন কাঠামো	শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার (%)	আয় (টাকা)	শ্রমিকের সংখ্যা (জন)	শতকরা হার (%)
১০০০-২০০০	২	১.৩৯	৫০০০-এর কম	৬	৫.৪৫
২০০০-৩০০০	২৭	২৫	৫০০০-৮০০০	৩৪	৩০.৯০
৩০০০-৪০০০	৪০	৩৬.১১	৮০০০-১২০০০	৪৯	৪৪.৫৫
৪০০০-৫০০০	৪১	৩৭.৫	১২০০০-১৬০০০	৬	৫.৫৫
মোট	১১০	১০০	১৬০০০-২০০০০	৩	৫.৪৫
			২০০০০-এর বেশি	১২	১০.৯১
			মোট	১১০	১০০

উৎস : প্রশ্নমালা জরিপ, ২০১২

পোশাকশ্রমিকদের ক্ষেত্রে অপারেটর ও হেলপারদের বেতন কম। তবে কারখানা অনুযায়ী মাসিক আয়ের ব্যাপক ভিন্নতা লক্ষ করা গেছে। সরকার ঘোষিত নিয়ম অনুযায়ী যেখানে সর্বনিম্ন বেতন ৩০০০ টাকা হওয়ার কথা, সেখানে অনেক কারখানায় প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা হয় মাত্র ১৫০০ টাকা। সর্বোচ্চ ৩৭.৫ শতাংশ শ্রমিকের মাসিক বেতন ৪০০০-৫০০০ এর মধ্যে, ৩৬.১১ শতাংশের মাসিক বেতন ৩০০০-৪০০০ এর মধ্যে। আর ২৬.৩৯ শতাংশ শ্রমিকের বেতন ৩০০০ টাকার নিচে, যা সরকার ঘোষিত নীতিবিরোধী। এই হিসেবে শ্রমিকদের গড় বেতন ৩৩৯৯.৩৮ টাকা (সারণি ৬)।

উত্তরদাতাদের পারিবারিক আয়-সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায়, সর্বোচ্চ ৪৪.৫৫ শতাংশ শ্রমিকের পারিবারিক আয় ৮০০০-১২০০০ টাকা, সর্বনিম্ন ৫.৪৫ শতাংশের পারিবারিক আয় ১৬০০-২০০০ টাকা এবং ৫০০০ টাকার কম। মাত্র ১০.৯১ শতাংশের পারিবারিক আয় ২০০০০ টাকার ওপরে। উপর্যুক্ত সারণি থেকে দেখা যায়, ৩০.৯০ শতাংশের পারিবারিক আয় ৫০০০-৮০০০ টাকা ও ৫.৫৫ শতাংশ শ্রমিকের পরিবারের মাসিক আয় ১২০০০-১৬০০০ টাকা (সারণি ৬)। গবেষণার তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এসব পরিবারে গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে নারীদের আয় যুক্ত না-হলে তাদের পরিবার গভীর সমস্যায় নিপতিত হতো। তাদের আয় পরিবারে আশার আলোর সঞ্চার করেছে।

নারী পোশাকশ্রমিকদের ক্ষমতায়ন

ক্ষমতায়ন শব্দটি একটি জনপ্রিয় পরিভাষা হিসেবে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কল্যাণ, উন্নয়ন, অংশগ্রহণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের মতো শব্দগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়। ক্ষমতায়ন মানে হলো যেসব বিরাজিত কাঠামোগত অসমতা নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের পশ্চাদপদ করে রাখে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা থেকে উত্তরণ। এই যৌথ প্রচেষ্টায় পুরুষ অংশীদার, ক্ষমতার জন্য পুরুষদের সঙ্গে নারীর বৈরিতামূলক সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা নয়। এই প্রচেষ্টা হলো নারীর শক্তি সঞ্চয় করার জন্য পুরুষকে সহায়ক শক্তি হিসেবে গণ্য করা। ক্ষমতায়ন-সম্পর্কিত আলোচনার আদর্শিক ধারণা হলো— পুরুষদের সাথে সহাবস্থানে, সমমর্যাদায় নারীর অবস্থান উন্নীত হওয়া প্রয়োজন। কেননা

নারীরাও সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক। প্রক্রিয়া হিসেবে উন্নয়ন বহুমাত্রিক, যার সঙ্গে নারীরাও সম্পৃক্ত। সমাজের যে সকল কর্মকাণ্ডে নারীরা নিয়োজিত হন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীসমাজ যথাযথ মূল্যায়নে অধিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ সহাবস্থানে দাঁড়াবার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হবে। কারণ জ্ঞান, আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও তা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও প্রভাবিত করার সক্ষমতা এবং সুযোগ অর্জনই হলো ক্ষমতায়ন (সুলতানা, ১৯৯৮)।

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (১৯৯৪) ক্ষমতায়নকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছে, যা ব্যক্তিবর্গকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তনে সক্ষম করে। এটি অত্যাচারিত সামাজিক শক্তিসমূহের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নির্দেশ করে এবং ক্ষমতা-সম্পর্কে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে কাজ করে। ক্ষমতায়ন ক্ষমতাবাজদের কাছ থেকে ক্ষমতাহীনদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায়—

১. বস্তুগত সম্পদ, যার মধ্যে রয়েছে, স্থানিক সম্পদ, যেমন জমি, জলাশয় ও বনভূমি ইত্যাদি; মানবিক সম্পদ, যেমন মানবদেহ এবং আর্থিক সম্পদ, যথা অর্থ;
২. বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ, যেমন জ্ঞান, তথ্য এবং ধারণা ইত্যাদি;
৩. আদর্শিক সম্পদ, যেমন একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানুষ যেভাবে উপলব্ধি করে এবং সক্রিয় হয়;

এই তিন ধরনের সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা (রহমান, ১৯৯৭)।

উত্তরদাতাদের ক্ষমতায়ন তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে— নারীশ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ, পরিবারে মতামত প্রদানের স্বাধীনতা, অর্জিত বেতনের টাকা নিজে খরচ করার স্বাধীনতা। নিম্নের সারণিতে বিষয়গুলো দেখানো হলো—

সারণি ৭

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ের সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীশ্রমিকের অংশগ্রহণ

সিদ্ধান্তগ্রহণের স্বাধীনতা	চাকুরির পূর্বে		চাকুরির পরে	
	শ্রমিকের সংখ্যা	শতকরা হার (%)	শ্রমিকের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারেন	৪৩ জন	৩৯.০৯	৬৭ জন	৫৩.৬৪
সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারেন না	৬৭ জন	৬০.৯১	৪৩ জন	৪৬.৩৬
মোট	১১০	১০০	১১০	১০০

উৎস : প্রশ্নমালা জরিপ, ২০১২

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, মাত্র ৩৯.০৯ শতাংশ নারী পোশাকশ্রমিক চাকুরিতে যোগদানের পূর্বে পরিবারে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু চাকুরি গ্রহণের পর অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম হওয়ায় এখন ৫৩.৬৪ শতাংশ নারীশ্রমিক তাদের পরিবারের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন। অন্যদিকে চাকুরি করার পূর্বে ৬০.৯১ শতাংশ এবং চাকুরি করার পরে ৩৪.৫৫ শতাংশ নারী তাদের পরিবারে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি ও পারেন না। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির ফলে নারীর ক্ষমতায়নের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৮

পারিবারিক পর্যায়ে চাকুরির পূর্বে ও পরে নারীশ্রমিকের মতামতের গুরুত্ব

মতামতের গুরুত্ব	চাকুরির পূর্বে		চাকুরির পরে	
	শ্রমিকের সংখ্যা	শতকরা হার (%)	শ্রমিকের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
আছে	৪৪	৪০.০০	৭২	৬৫.৪৫
নেই	৬৬	৬০.০০	৩৮	৩৪.৫৫
মোট	১১০	১০০	১১০	১০০

উৎস : প্রশ্নমালা জরিপ, ২০১২

প্রাপ্ত তথ্য মতে, চাকুরি করার পূর্বে ৪০ শতাংশ নারীশ্রমিকের মতামত বাসায় গুরুত্ব সহকারে নেয়া হতো। কিন্তু চাকুরি করার পর ৬৫.৪৫ শতাংশের মত গুরুত্বের সাথে নেয়া হয়। এ থেকে সুস্পষ্ট যে, অর্থনৈতিক সক্ষমতা না-থাকার ফলেই তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হতো না। অর্থাৎ গার্মেন্টসে কাজ করার মাধ্যমে নারীশ্রমিকরা নিজেদের অবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন (সারণি ৮)। তাই বলা যায়, নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের বিকল্প নেই।

সারণি ৯

অর্জিত বেতনের টাকা খরচ করার স্বাধীনতা

খরচের ধরন	শ্রমিকের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিজের ইচ্ছায়	৫৯	৫৭.২৭
অন্যের ইচ্ছায়	৪৭	৪২.৭৩
মোট	১১০	১০০

উৎস : প্রশ্নমালা জরিপ, ২০১২

প্রাপ্ত তথ্য মতে, গার্মেন্টসে কাজ করার ফলে পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন স্পষ্ট। দেখা যাচ্ছে, ৫৭.২৭ শতাংশ নারীশ্রমিক বেতনের টাকা স্বেচ্ছায় খরচ করতে পারেন এবং ৪২.৭৩ শতাংশ স্বেচ্ছায় খরচ করতে পারেন না (সারণি ৯)। এ তথ্য তাদের ক্ষমতায়নের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।

শ্রমিকদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও কর্মক্ষেত্রের সমস্যা

ঢাকা শহরের পোশাকশ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, ৮৯.০৯ শতাংশ শ্রমিক কর্মস্থলে আসার পথে এবং কর্মস্থলে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন; ৮৬.৩৬ শতাংশ শ্রমিককে পরিবার ও পরিবারের বাইরে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। এছাড়াও জানা গেছে, ৯২.৭৩ শতাংশ শ্রমিক শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে যুক্ত। এছাড়া অধিকাংশ শ্রমিক 'শ্রমিক ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘ'— এই শব্দটির সাথেই পরিচিত নন। এর সাথে তাদের যুক্ত হওয়া কল্পনাতীত। তাছাড়া যেসব পোশাক কারখানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘ নেই। ৫৭.২৭ শতাংশ শ্রমিক নিজের উপার্জিত টাকা নিজে খরচ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে তাদের টাকা খরচ করতে হলে স্বামী বা পরিবারপ্রধান (মা-বাবা) থেকে অনুমতি নিতে হয়। গবেষণায় আরো দেখা যায়, ৭৮.১৮ শতাংশ শ্রমিকের শ্রমআইন সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই (সারণি ১০)।

সারণি ১০

নারী পোশাকশ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সমস্যার বিন্যাস

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সমস্যা	শ্রমিকের সংখ্যা (১১০ জন শ্রমিকের মধ্যে)	শতকার হার (%)
কর্মস্থলে আসার পথে এবং কর্মস্থলে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন	৯৮ জন	৮৯.০৯
নির্যাতনের শিকার হয়েছেন	৯৫ জন	৮৬.৩৬
শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে যুক্ত নন	১০২	৯২.৭৩
বেতনের টাকা নিজে খরচ করতে পারেন না	৬৩	৫৭.২৭
শ্রমআইন ২০০৬ সম্পর্কে ধারণা নেই	৮৬	৭৮.১৮

উৎস : প্রশ্নমালা জরিপ, ২০১২

নারীশ্রমিকদের অধিকাংশই 'অধিকার' শব্দটির সাথে পরিচিত নন। ফলে শ্রমআইন ২০০৬-এ শ্রমিক হিসেবে তাদের কোন ধরনের কী কী সুবিধা প্রাপ্তির কথা রয়েছে, তা তারা জানেন না। সরকার কর্তৃক ঘোষিত বেতন কাঠামো অনুযায়ী গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ৩,০০০ টাকা হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। গবেষণায় দেখা যায়, ২৬.৩৬ শতাংশ শ্রমিকের বেতন ৩০০০ টাকার নিচে। গার্মেন্টস শ্রমিকরা বিনোদন সুবিধা হিসেবে শুধুমাত্র গান শোনার সুযোগ পেলেও ৭৫.৪৫ শতাংশ শ্রমিক চিত্তবিনোদনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ৩০.৯১ শতাংশ গার্মেন্টসে ডে-কেয়ার সুবিধা দেখা গেলেও কোনো গার্মেন্টসেই ব্রেস্ট ফিডিং রুম পাওয়া যায় নি। কিন্তু শ্রমআইনে ডে-কেয়ার সেন্টার ও নবজাতক শিশুকে যাতে ব্রেস্ট ফিডিং করানো যায় এমন জায়গা থাকার বিধান রয়েছে; যা গার্মেন্টসের মালিকেরা হয়ত আমলে নেয়ার প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেন নি। কারণ যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তার একটিতেও এ সুবিধা থাকার কথা জানা যায় নি।

শ্রমআইনে শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা বা ভাতা প্রাপ্তির বিধান রয়েছে, যা অধিকাংশ গার্মেন্টসে দেয়া হয় না। কিছু প্রতিষ্ঠানে ডাক্তার আছেন যিনি প্রেসক্রিপশন করে দেন, কিন্তু তাদের বাইরে থেকে

ওষুধ কিনতে হয়। চিকিৎসা ভাতার পরিবর্তে চিকিৎসা সুবিধা পান ৭২.৭৩ শতাংশ শ্রমিক এবং বাকি ২৭.২৭ শতাংশ কোনো ভাতা বা সুবিধা পান না। শ্রমআইন ২০০৬ অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শ্রমকল্যাণ কর্মকর্তা রাখার বিধান থাকলেও মাত্র ৩১.৮২ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন যে, তাদের প্রতিষ্ঠানে শ্রমকল্যাণ কর্মকর্তা আছেন।

কারখানার পরিবেশ কেমন হতে হবে, একটি ফ্লোরে কতজন শ্রমিক কাজ করবে, বিশুদ্ধ পানি পানের ব্যবস্থা কীরূপ হবে, একটি টয়লেট কতজন ব্যক্তি ব্যবহার করবে, একটি ফ্লোর কত বর্গফুট হবে, আলো-বাতাসের কী পরিমাণ ব্যবস্থা থাকবে— এর সবই কারখানা আইনে উল্লিখিত আছে। গবেষণায় দেখা যায়, ৩২.৭৩ শতাংশ শ্রমিক বলেছেন, তারা যে কারখানায় কাজ করেন সেখানে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই এবং ১৩.৬৪ শতাংশ মনে করেন তাদের কর্মপরিবেশ ঝুঁকিপূর্ণ। সরেজমিনে এমন গার্মেন্টস দেখা গেছে, যার দরজাহীন টয়লেট ছাদে অবস্থিত, দরজার স্থলে সেখানে বস্তা লাগানো। এরকম পরিবেশে অন্যান্য ব্যবস্থা কতটুকু ভালো হবে তা সহজেই অনুমেয়। শ্রমআইন ২০০৬-এ দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণের কথা বলা হলেও এ গবেষণায় দেখা যায়, ৩৭.২৭ শতাংশ শ্রমিক দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ পান না বলে জানিয়েছেন (সারণি ১১)।

সারণি ১১

নারী পোশাকশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে অধিকার (শ্রমআইন ২০০৬) লঙ্ঘনের চিত্র

কর্মক্ষেত্রে সমস্যা	**শ্রমিকের সংখ্যা** (১১০ জন শ্রমিকের মধ্যে)	**শতকার হার** (%)
ন্যূনতম বেতন ৩০০০ টাকার কম	২৯ জন	২৬.৩৬
চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা নেই	৮৩ জন	৭৫.৪৫
ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা নেই	৭৬ জন	৬৯.০৯
ব্রেস্ট ফিডিং রুম নেই	১১০ জন	১০০
প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধা নেই	৩০ জন	২৭.২৭
শ্রমকল্যাণ কর্মকর্তা নেই	৭৫ জন	৬৮.১৮
কারখানাতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই	৩৬ জন	৩২.৭৩
কর্মপরিবেশ ঝুঁকিপূর্ণ	১৫ জন	১৩.৬৪
দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় না	৪১ জন	৩৭.২৭
যাতায়াত সুবিধা পান না	৯৮ জন	৮৯.০৯
আবাসন সুবিধা নেই	১১০ জন	১০০
চাকুরি প্রদানের সময় নিয়োগপত্র প্রদান করা হয় না	৬৭ জন	৬০.৯১
চাকুরিচ্যুত করার সময় নোটিশ প্রদান করা হয় না	৮১ জন	৭৩.৬৩
দৈনিক আট ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয়	৮৭ জন	৭৯.০৯

চলমান

কর্মক্ষেত্রে সমস্যা	শ্রমিকের সংখ্যা (১১০ জন শ্রমিকের মধ্যে)	শতকার হার (%)
দুপুরের খাবারের জন্য ১ ঘণ্টার কম সময় দেয়া হয়	২১ জন	১৯.০৯
মাতৃত্বকালীন ছুটি নেই	২৪ জন	২১.৮২
নৈমিত্তিক ছুটি দেয়া হয় না	৪০ জন	৩৬.৩৬
ওভারটাইম করতে বাধ্য করা হয়	২৩ জন	২০.৯১
মালিকপক্ষ অতিরিক্ত কাজ করাতে বাধ্য করে থাকেন	১৯ জন	১৭.২৭
নাইট ডিউটি করতে বাধ্য করা হয়	১৪ জন	১২.৭৩
নিয়মিত মজুরি প্রদান করা হয় না	১৪ জন	১২.৭৩

উৎস : প্রশ্নমালা জরিপ, ২০১২

যেসব নারীশ্রমিকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তাদের ৮৯.০৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠান থেকে যাতায়াত সুবিধা পান না বা এ বাবদ ভাতাও পান না বলে জানিয়েছেন। তবে বিজিএমইএ-এর অধীনে কাজ করা শ্রমিকরা এই সুবিধা পান। গবেষণায় আরো দেখা যায়, কোনো গার্মেন্টসই শ্রমিকদের আবাসন সুবিধা প্রদান করে না। কিছু প্রতিষ্ঠানে আবাসন ভাতার নামে যে পরিমাণ অর্থ দেয়া হয়, তা দিয়ে আবাসন সুবিধার নিশ্চয়তা তো দূরের কথা ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোও সম্ভব নয়।

৬০.৯১ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, চাকুরি প্রদানের সময় গার্মেন্টস মালিকপক্ষ তাদের নিয়োগপত্র প্রদান করেন নি এবং ৭৩.৬৩ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, চাকুরিচ্যুত করার সময় আগাম নোটিশ দেয়া হয় না, কোনোদিন কাজে গিয়ে তারা জানতে পারেন যে তাদের চাকুরি নেই।

১৮৮৬ সালের পহেলা মে শিকাগো শহরে শ্রমিকদের আন্দোলন সংগ্রামের ফলে শ্রমিকদের কর্মসময় ৮ ঘণ্টা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে পোশাকশ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা মানা হয় না। গবেষণায় দেখা যায়, ৭৯.০৯ শতাংশ শ্রমিককে দৈনিক ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয়। বাংলাদেশ শ্রমআইন ২০০৬-এ বলা আছে, কোনো প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক সপ্তাহে মোট ৪৮ কর্মঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারবে না। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায়, অধিকাংশ নারীশ্রমিককে পোশাক কারখানায় সপ্তাহে গড়ে মোট ৬০ ঘণ্টা কাজ করতে হয়; যা শ্রমআইন পরিপন্থী। শ্রমআইন ২০০৬-এ শ্রমিকদের দুপুরের খাবারের জন্য ১ ঘণ্টা সময় দেবার কথা বলা থাকলেও ১৯.০৯ শতাংশ শ্রমিক এজন্য ১ ঘণ্টা সময় পান না।

বাংলাদেশ শ্রমআইন ২০০৬-এ বলা আছে, প্রত্যেক নারীশ্রমিক তার কারখানার মালিকের কাছ থেকে সন্তান প্রসব ও প্রসবপরবর্তী আট সপ্তাহের জন্য প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পাবার অধিকারী হবেন এবং মালিক তাকে এই সুবিধা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু এই গবেষণায় দেখা যায়, ২১.৮২ শতাংশ নারীশ্রমিক মাতৃত্বকালীন ছুটি পান না বলে জানিয়েছেন। এছাড়াও ২০.৯১ শতাংশ মালিকপক্ষ ওভারটাইম করতে বাধ্য করেন, ১৭.২৭ শতাংশ শ্রমিককে মালিকপক্ষ অতিরিক্ত কাজ

করতে বাধ্য করেন, ১২.৭৩ শতাংশ শ্রমিককে মালিকপক্ষ নাইট ডিউটি করতে বাধ্য করেন এবং ১২.৭৩ শতাংশ শ্রমিককে মালিকপক্ষ নিয়মিত মজুরি প্রদান করেন না (সারণি ১১)।

গবেষণা থেকে দেখা গেছে, অধিকাংশ গার্মেন্টসে কোনো ক্যান্টিন নেই। এমনকি শ্রমিকরা বসে খাবার খেতে পারবেন এবং সামান্য সময় বিশ্রাম নিতে পারবেন এমন কোনো ব্যবস্থাও নেই। কিছু প্রতিষ্ঠানে কর্মস্থলে আর কিছু প্রতিষ্ঠানে ছাদে বসে শ্রমিকরা টিফিন গ্রহণ করেন। এসব তথ্য থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রচলিত আইনের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ আচরণ করছেন এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কোনো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না।

সুপারিশমালা

উৎপাদনযন্ত্র হিসেবে সমাজের দরিদ্র শ্রেণি শোষিত হলেও তাদের কল্যাণ ও অধিকার সর্বক্ষেত্রে অনুপস্থিত থেকেছে। কিন্তু শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টি সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় স্বীকৃত হয়েছে। তাদের জীবন উন্নয়নের প্রতিটি উপাদান, যেমন শারীরিক ও মানসিক শক্তি, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, কাজের প্রতি অঙ্গীকার, দায়বদ্ধতা, আন্তরিকতা ইত্যাদির অর্জন প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক শ্রমমান অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকারগুলো প্রাপ্তির ওপর। শ্রমের মাধ্যমে তার ব্যক্তিজীবন ও পরিবারের উন্নতি সাধনের অধিকারও শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার। এই অধিকারটি আইএলও কর্তৃক ঘোষিত কর্মক্ষেত্রের মৌলিক নীতি ও অধিকার ঘোষণায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় দেখা যায়, যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অধিক হারে নারীশ্রমিক নিয়োজিত, সেখানেই তারা অধিকার থেকে বেশি বঞ্চিত হয়। পরিহাসের বিষয় হলো, নারীরা পুরুষের মতো শ্রমবাজারে প্রবেশ ও অর্থ উপার্জন শুরু করেও পুরুষের সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারছেন না। শত লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার পরেও গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারীশ্রমিকরা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছেন শুধু খাওয়া-পরার নিশ্চয়তা বিধানে এবং একটু ভালো থাকবেন সে আশাকে বুকে লালন করে। এ অবস্থায় গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক দিক বিবেচনা করে এবং শ্রমিকদের নানাবিধ সমস্যার আলোকে ও তাদের কল্যাণার্থে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা তুলে ধরা হলো—

১. শ্রমআইন ২০০৬ অনুসারে দুপুরে একঘণ্টা খাবার সময়সহ শ্রমিকদের কর্মসময় ৮ ঘণ্টা হবার কথা বলা হলেও অধিকাংশ শ্রমিককেই ৯-১২ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এ ব্যাপারে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সচেতন দৃষ্টি প্রয়োগ করতে হবে;

২. কর্মের বিনিময়ে যথাসময়ে মজুরি লাভ কর্মীর অধিকার। তাই শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া, নিয়মিত মজুরি পেলে গার্মেন্টস শ্রমিকরা মানসিকভাবে অনেক ভালো থাকেন এবং মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হন। চাকুরির প্রতি তাদের আস্থা বেড়ে যায় ও কর্মে দায়িত্ববান হন;

৩. গার্মেন্টস শ্রমিকরা সরকার কর্তৃক ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি ঠিকভাবে পান না। নিঃসন্দেহে পোশাকশ্রমিকদের শ্রমবাজারে টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের ন্যূনতম মজুরি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার ও মালিক কর্তৃপক্ষের আরো আন্তরিক ভূমিকা পালন করতে হবে। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০০০ টাকা হওয়ার কথা থাকলেও সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে,

অনেক কারখানায় নারীশ্রমিকদের প্রারম্ভিক বেতন মাত্র ১২০০ টাকা। এ অবস্থার নিরসনে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি সরকার কর্তৃক ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি ৩০০০ টাকা থেকে বাড়ানো প্রয়োজন;

৪. কারখানায় কাজ করতে ইচ্ছুকদের জন্য বিজিএমইএ কর্তৃক ন্যূনতম ৩ মাসের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা দক্ষ হয়ে তাদের কাজে নিয়োজিত হতে পারে। পাশাপাশি গার্মেন্টস শিল্প কারখানায় নিয়োজিত অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত শ্রমিক কর্মচারীদের দক্ষ করে তোলার জন্য সরকার ও মালিকপক্ষের উদ্যোগে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৫. শ্রমআইন ২০০৬ অনুযায়ী প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে ডাক্তার রাখার বিধান রয়েছে। এজন্য প্রতিটি গার্মেন্টসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ করতে হবে। এর পাশাপাশি সরকারের 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার' প্রকল্পে কর্মজীবী নারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিকিৎসা প্রদানের নীতি গ্রহণ করা জরুরি। এজন্য প্রকল্প কেন্দ্রগুলো এমনসব স্থানে স্থাপন করা উচিত, যেখানে শ্রমিকদের যাতায়াত করা সহজ হবে;

৬. পোশাকশ্রমিকদের জন্য স্বতন্ত্র গার্মেন্টস পল্লি গড়ে তুলতে হবে। এতে একদিকে যেমন তাদের আবাসন সংকট দূর করা সম্ভব হবে, অন্যদিকে তাদের কাজে মনোযোগ ও কর্মপ্রেষণা বৃদ্ধি পাবে;

৭. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত গার্মেন্টস শিল্প কারখানায় নিয়োজিত নারীশ্রমিকদের আবাসিক সমস্যা সমাধান ও তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল স্থাপন করতে হবে;

৮. ১৯৪৮ সালে ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ধারা ২৪ অনুসারে সকলেরই বিশ্রাম ও বিনোদনের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ১৫(খ) ও (গ) অনুযায়ী কর্মে যুক্তিসংগত মজুরির সঙ্গে বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ গার্মেন্টস কারখানায় বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা নেই। বিশ্রামকক্ষে অবশ্যই টেলিভিশন, রেডিও ও কিছু ইনডোর খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকা উচিত;

৯. বাংলাদেশে সংবিধানের ধারা ৩৪ অনুসারে সকল প্রকার জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ হলেও বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকদের দিয়ে জবরদস্তি শ্রম করানো হয়। এটি যাতে না হয় সেদিকে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে মনিটরিং করতে হবে;

১০. বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা ১৫(খ) ও (গ)-তে কর্মঅধিকার ও কর্মনিশ্চয়তার অধিকারের কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু গার্মেন্টস শ্রমিকদের চাকুরির তেমন কোনো নিরাপত্তা নেই। এ অধিকার নিশ্চিত করতে শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

১১. বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা ২৯(ক) ও (খ), সর্বজনীন মানবাধিকার ১৯৪৮-এর ধারা ২৩(খ) ও (গ)-তে নারী ও পুরুষের সমান মজুরির কথা থাকলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। এক্ষেত্রে সরাসরি ও কঠোর আইন প্রয়োগ করে সকলের সমমজুরি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে;

১২. সিডও সনদের ধারা ১১(ক) অনুযায়ী প্রসূতিকালীন মায়েদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষতিকারক কাজ থেকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রসূতি মায়েদের দিয়ে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো হয় ও পূর্ণ মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান করা হয় না। ছুটি প্রদান করলেও ওই সময় তাদের নিয়মিত বেতন প্রদান করা হয় না। এ অবস্থার নিরসনে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে;

১৩. শ্রমিকদের চিকিৎসা ভাতা, ক্যান্টিন সুবিধা, যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;

১৪. শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা ও তাতে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;

১৫. বিজিএমইএ নারীদের নিরাপত্তার জন্য যেসব কর্মসূচি চালু করেছে তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে ও এর কার্যপরিধি বৃদ্ধি করতে হবে;

১৬. সিডও সনদের ধারা ১১(চ) অনুযায়ী বৈবাহিক অবস্থাজনিত কারণে চাকুরিতে নিয়োগ বা চাকুরিচ্যুত করা নিষেধ। কিন্তু পোশাকশ্রমিকদের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটছে। এজন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;

১৭. কর্মক্ষেত্রের ভৌত পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কারখানা আইন মান্য করা অতীব জরুরি। এই আইন অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে;

১৮. প্রতিটি কারখানায় অগ্নিনির্বাপণ ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আরো উন্নত করা এবং এ বিষয়ে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত এবং দুর্ঘটনায় পতিত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৯. শিল্পক্ষেত্রের কর্ম-অবস্থা মানবেতর রূপ নেয়ার পেছনে মালিকের অতিরিক্ত মুনাফালোভ এবং অবহেলাই দায়ী। বাংলাদেশ সরকারের শ্রমআইন কার্যকর করার ব্যর্থতাও বহুলাংশে দায়ী। তাই শ্রমআইন কার্যকর করার জন্য সরকারকে বিশেষ পদ্ধতি প্রণয়ন করতে হবে। সরকারের শ্রমআইন পর্যবেক্ষক দলের ক্ষমতা এবং দায়বদ্ধতা বাড়াতে হবে। তাছাড়া আইএলওর সদস্য হিসেবে 'ILO Declaration on Fundamental Principles and Right at Work'-কে কার্যকর করার জন্য সরকারকে অতি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

উন্নয়নশীল রাষ্ট্র বাংলাদেশের পোশাকশিল্প বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করছে। এ খাতে নিয়োজিত নারীশ্রমিকরা এ শিল্পের উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলেও তাদের ন্যূনতম সুযোগ প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে না। অবহেলা ও অযত্নের মধ্যে থেকেও তারা নিজের, নিজের পরিবার ও সমাজের জন্য অনবদ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। পোশাকশিল্প দরিদ্র বাঙালি নারীদের সেই সুযোগ দিয়েছে, যা তাদের পশ্চাৎপদ জীবন থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছে। কিন্তু তারপরও যতটুকু সুবিধা তাদের প্রাপ্য তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। তাদের পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা প্রদান করলে যে চূড়ান্তভাবে তা কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এই সহজ সত্যটি কারখানা কর্তৃপক্ষ হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ শিল্পের ভূমিকা

অনবদ্য, কিন্তু তা তখনই অনন্য হবে যখন নারীশ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য সুবিধা পাবেন, যখন তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন থেকে বেরিয়ে সুস্থ-সুন্দর জীবনে পদার্পণ করবেন। এজন্য সরকার প্রদত্ত আইনসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরি, প্রয়োজন সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সমন্বয়।

পরিশেষে বলা যায়, আলোচিত সুপারিশমালা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারীশ্রমিকদের কর্মনিরাপত্তা ও কর্মসন্তুষ্টি নিশ্চিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। এজন্য দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক অঙ্গীকার, যথাযথ শ্রম নিরাপত্তামূলক আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন, বৈদেশিক সাহায্যের যথাযথ ব্যবহার ও সর্বোপরি মালিকপক্ষকে মনে রাখতে হবে যে, গার্মেন্টস শ্রমিকদের কর্মনিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করাটা কেবল শ্রমিকের স্বার্থেই প্রয়োজনীয় নয়, মালিক এবং দেশের স্বার্থেও তা জরুরি।

মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন গবেষক, প্রাবন্ধিক ও সংস্কৃতি কর্মী। muhammadjasimuddin@yahoo.com।

সহায়ক গ্রন্থ

১. বাংলাদেশে মানবাধিকার ২০০৮, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ঢাকা।

২. আরেফিন, ড. মো. ছাদেকুল, ২০০৭, "ক্ষমতায়ন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী", ঢাকা; এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ।

৩. রশীদ, আবদুর, ২০১০, "ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার শ্রমিক অধিকার", গার্মেন্টস কণ্ঠ, মে দিবস সংখ্যা।

৪. আলম, আশরাফুল ও করিম, ড. ইকবাল, ২০১০, "বাংলাদেশ শ্রমআইন", ঢাকা; কামরুল বুক হাউজ।

৫. ওসমান, আসমার ও মনসুর, লায়লা, ২০১০। "বাংলাদেশ পোশাকশিল্পের বর্তমান প্রবণতা", ঢাকা; নিউ এজ প্রকাশনী।

৬. কবির, লায়লা, ১৯৯০, "বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে নারীর পরিশ্রম : সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা", ঢাকা; একতা পাবলিকেশন্স।

৭. খান, মোহাম্মদ আলী, ১৯৯৬, "শ্রমকল্যাণ শিল্প সম্পর্ক ও শ্রমিক আন্দোলন", ঢাকা; নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

৮. গাইন, ফিলিপ, ১৯৯০, "বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে নারী শ্রমিক", ঢাকা; বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ।

৯. রহমান, শাহীন, ১৯৯৭, জেন্ডার পরিভাষা/শব্দ কোষ, ৭ম সংখ্যা, জানু-মার্চ, উন্নয়ন প্রদক্ষেপ, স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলাপমেন্ট, ঢাকা।

১০. রেজা, কাজী রীনা, ২০০৫, "গার্মেন্টস শ্রমিকদের দুরবস্থা", RMG Sector of Bangladesh and its Workers, স্মারকপত্র, বাংলাদেশ সংযুক্ত গার্মেন্টস-শ্রমিক ফেডারেশন, দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন ২০০৫, ঢাকা।

১১. সাদিয়া, আসমা, ২০০৬ "নারীর ক্ষমতায়ন", ঢাকা; নিউ শিখা প্রকাশনী।

১২. সুলতানা, আবেদা, ১৯৯৮, "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি : একটি বিশ্লেষণ", ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ২, সাল, ১৯৯৮, ঢাকা; উইমেন ফর উইমেন।

১৩. BGMEA, 2012 থেকে সংগৃহীত বেতন কাঠামো ও অন্যান্য তথ্য।

১৪. Dannecker, Petra, 2002, "Between conformity and resistence- Women Garment Workers in Bangladesh."

১৫. Human Development Report-1994, 1994, UNDP, Oxford Universit Press, Delhi, India.

১৬. Islam, Mainul, 1991, "Labour Migration and Development: A case study of a rural community in Bangladesh". Bangladesh Journal of Political Economy 11 (2).

১৭. Paul-Majumder, P. and Begum, A., 2000, "The Gender Imbalances in the ExportOriented Garment Industry in Bangladesh", Working Paper, Poverty Reduction and Economic Management Network, The World Bank, Available at:http://sitere-sources.worldbank.org/INTGENDER/Resources / trademajumder.pdf (last consulted: March 3, 2010).

১৮. Paul-Majumder, P. (2000), "Violence and Hazards suffered by; Women in Wage Employment: A case of Women Working in the Export-Oriented Garment Industry of I Bangladesh" Empowerment, Women for Women, Vol. 7, Dhaka, Bangladesh.

১৯. Paul-Majumder, P. (2002), "Organizing Women Garment Workers: A means to Address the Challenges of Integration of the Bangladesh Garment Industry in the Global Market", in Muhammed Muqtada, Andrea M. Singh and Mohammed All Rashid (ed) 'Bangladesh: Economi and Social Challenges of Globalisation' UPL, Dhaka Bangladesh.

২০. Universal Declaration of Human Rights, 1948. United Nations.